Vol. 59 | No. 1-2 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে: কবির মগ্নচৈতন্যের আর্কাইভ

Volume	59
Issue	1-2
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Golam Mahmud Pavel
Published online	December 31, 2024
DOI	10.62328/sp.v59i1-2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i1-2.6
Pages	119-140
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩০॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৪
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i1-2

DOI: 10.62328/sp.v59i1-2.6
প্রবন্ধ জমাদান: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ৫ মে ২০২৪
পৃষ্ঠা: ১১৯-১৪০

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে: কবির মগ্নচৈতন্যের আর্কাইভ

গোলাম মাহ্‌মুদ পাভেল
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: gmpavel3@gmail.com

সারসংক্ষেপ

কবিমনের অনুভূতিরাশিই যে কবিতার মৌল উপজীব্য, এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু বিগত শতাব্দীতে মনের একাধিক স্তর আবিষ্কৃত হওয়ার পর কবিতা মনের কোন স্তরের অনুভূতির প্রকাশক হওয়া বিধেয়, তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানা মতবাদ। মনের চেতন স্তরের পরিবর্তে মগ্নচেতন স্তরের অনুভূতিরাশিকে কবিতায় তুলে আনার লক্ষ্যে জন্ম হয়েছে ডাডাবাদ, পরাবাস্তববাদের মতো শিল্পান্দোলনের। পাশ্চাত্যের এসব শিল্প-মতবাদ ও আন্দোলন অনিবার্যভাবে প্রভাব ফেলেছে আধুনিক বাংলা কবিতায়। বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের কবি শামসুর রাহমানের কবিতায়ও চেতন মনের সাথে মগ্নচৈতন্যের উপস্থিতি দুর্লক্ষ্য নয়। তবে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী কয়েক বছর (১৯৭৪-১৯৭৭) তিনি চেতন মনের যুক্তিশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার পরিবর্তে আপন মগ্নচৈতন্যের গভীরে ডুব দিয়ে স্বপ্ন ও বাস্তবের সংমিশ্রণে কবিতায় এক পরাবাস্তব জগৎ নির্মাণেই অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বর্তমান প্রবন্ধে কবির *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে* কাব্যের প্রধান কবিতাবলি অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে এ বক্তব্যের সত্যতা যাচাইপূর্বক বিশ্লেষিত কবিতাগুলো পর্যালোচনা করে তাঁর মগ্নচৈতন্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত প্রবন্ধের শুরুতে ডাডাবাদ ও পরাবাস্তববাদ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা-সূত্রে সিগমুন্ড ফ্রয়েড, কার্ল ইয়ুং ও জাক লাকাঁর তত্ত্বানুসারে 'মগ্নচৈতন্য' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ স্পষ্টীকরণ ও এর পরিধি নির্ণয় করা হয়েছে।

মূলশব্দ

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, মগ্নচৈতন্য, পরাবাস্তববাদ, ডাডাবাদ, চেতন মন, অবচেতন মন, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা।

১

আধুনিক যুগে সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয়-নৈতিক উদ্দেশ্য ও উপযোগিতার পরিবর্তে কবিতাকে তার অন্তর্নিহিত নান্দনিকতার মূল্যে মূল্যায়িত করার প্রবণতা দেখা দিলেও, কবিতা কখনোই তার দেশ-কালগত উপযোগিতাকে উপেক্ষা করতে পারেনি। যন্ত্রসভ্যতার বিকাশে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন, গোষ্ঠীবদ্ধ লোকসমাজের বিলুপ্তি ও গণতান্ত্রিক নাগরিক সমাজের বিকাশ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধের জাগরণ আধুনিক পাঠকের কাছে বাহ্যজগতের বাস্তবতানির্ভর কবিতার উপযোগিতা অনেকাংশে খর্ব করেছে। ফলত প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিতার তন্ময়ত্ব অনেকাংশে পরিহার করে আধুনিক কবিতা মন্ময়-চরিত্র পরিগ্রহ করেছে। বস্তুজগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ বা বহির্জাগতিক ঘটনা পরম্পরার বস্তুনিষ্ঠ বয়ানের পরিবর্তে আধুনিক কবিতা হয়ে উঠেছে ব্যক্তিকবির হৃদয়ানুভূতি, ভাবনাচিন্তা ও কল্পনার অনুভূতি-স্নিগ্ধ অভিপ্রকাশ।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব সমগ্র বিশ্বের মতো প্রকম্পিত করেছিল কবিকুলের চেতনালোকও। বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় মারণযজ্ঞ ও ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কুৎসিত চেহারার নগ্ন প্রকাশের ফলে কবিতায় 'যুদ্ধের পরে আসে চৈতন্যগত পরিবর্তন: অপরিবর্তনীয় বাস্তবজগৎসম্পর্কিত ধারণা এবং একরৈখিক র‍্যাশনাল মানবমন সম্পর্কে এতদিনকার স্থির প্রতীতিই টলে ওঠে, ফ্রয়েড, ইয়ুঙ প্রভৃতি চিন্তকের গবেষণার ফলে' (খোন্দকার আশরাফ ২০১৩: ১৬৬)। সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) প্রথম একশিলা মানবমনের ধারণাকে নাকচ করে অতলান্তিক রহস্যময়, ত্রি-স্তরীভূত ও ত্রি-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট মনের ধারণা প্রদান করেন। পরবর্তীতে কার্ল ইয়ুং (১৮৭৫-১৯৬১) বলেন, মানবমন পরস্পর ক্রিয়াশীল কতগুলো তন্ত্রের সমাহার। ফলে ব্যাকরণনিষ্ঠ ও ছন্দোবদ্ধ যে পঙ্‌ক্তিমালা এতদিন কবিমনের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুরণ বলে প্রশংসিত হয়ে আসছিল, তা-ই এখন প্রতিভাত হলো বুদ্ধির চাতুর্য বা মননের কারসাজি বলে। কারণ মানবমন তো সুশৃঙ্খল, ছন্দোবদ্ধ কোনো সুসজ্জিত পুষ্পোদ্যান নয়; বরং এর সুবৃহৎ অংশই বিশৃঙ্খল, অগোছালো ও কার্য-কারণ-ক্রিয়ার পারম্পর্যহীন। এ পটভূমিতেই সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহরে গড়ে ওঠে বুর্জোয়া শিল্প-সংস্কৃতি বিরোধী ডাডাবাদী (Dadaist) শিল্পান্দোলন, যা ১৯১৫ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে সমগ্র ইউরোপ-আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। মানবমনের যুক্তি-বুদ্ধি-অভ্যাসের দাস চেতন স্তরের পরিবর্তে মানুষের ব্যক্তিত্বের এবং চরিত্রের যথার্থ এবং পূর্ণাঙ্গ স্বাক্ষরবাহী অবচেতন স্তরকে কবিতায় তুলে আনতে চেয়েছিলেন ডাডাবাদীরা।[১] তবে অচিরেই (১৯২২ সালে) এই 'নৈরাজ্যবাদী ও নিহিলিস্ট' 'আঁভ গার্দ' আন্দোলনের অবসান ঘটে এবং এরই গর্ভে জন্ম নেয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি 'সকর্মক ও বিপ্লবী'[২] শিল্পান্দোলন পরাবাস্তববাদ (Surrealism)।

ফরাসি কবি আঁদ্রে ব্রেতঁর (১৮৯৬-১৯৬৬) পৌরহিত্যে উদ্ভূত, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সক্রিয় পরাবাস্তববাদী শিল্পান্দোলনের মূলভিত্তি ছিল ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব ও অবচেতন মনের ধারণা। যুক্তিশাসিত চেতন মনের পশ্চাতে যে হিমশৈলসদৃশ (iceberg) মগ্নচৈতন্যের জগৎ

রয়েছে, তার অতলান্তিক রহস্য উদ্‌ঘাটন করাই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। মানবমনের সামান্যতম অংশেই রয়েছে তার চেতন মনের দখলিস্বত্ব; এই ক্ষুদ্রতম চেতন অংশ বাদে মনের বাদবাকি পুরোটাই মগ্নচৈতন্যের জগৎ। 'মগ্নচৈতন্য' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'subconscious'। আবার 'অবচেতন' শব্দটিও 'subconscious'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে বহুল প্রচলিত। অর্থাৎ 'মগ্নচৈতন্য' শব্দটি ফ্রয়েড-কথিত 'subconscious' (অবচেতন) পরিভাষার সমার্থক। কিন্তু মনোবিজ্ঞান চর্চার প্রারম্ভিক পর্যায়ে 'subconscious' মনের ধারণা প্রদান করলেও ফ্রয়েড নিজেই পরবর্তী সময়ে এই ধারণা থেকে সরে আসেন এবং সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানীরাও 'subconscious' পরিভাষাটি ব্যবহারে পরাঙ্মুখ। চেতন মনের অগোচরে মানবমনের যে বিশাল অংশ সংগুপ্ত থাকে তাকে ফ্রয়েড পরবর্তীতে 'প্রাক-চেতন' (pre-conscious) ও 'অচেতন' (unconscious) এই দুই ভাগে ভাগ করেন। অর্থাৎ ফ্রয়েড-কথিত মনের তিনটি স্তর হলো: ১. 'চেতন'/'সংজ্ঞান' (conscious), ২. 'প্রাক-চেতন'/'আসংজ্ঞান' (pre-conscious) ও ৩. 'অচেতন'/'নির্জ্ঞান' (unconscious)। মনের এই ত্রি-স্তরের মধ্যে 'প্রাক-চেতন' ও 'অচেতন' স্তরকে সম্মিলিতভাবে মগ্নচৈতন্যের জগৎ বলা যায়।

ফ্রয়েড মনের উদ্দেশ্যসমূহের উৎস হিসেবে যে প্রকোষ্ঠত্রয়ের কথা বলেছেন সেগুলো হলো: ১. 'ইদ' (id), ২. 'ইগো' (ego) ও ৩. 'সুপার-ইগো' (super-ego)। এর মধ্যে 'ইদ'-এর পুরোটাই 'অচেতন' মনে অবস্থিত। আর 'চেতন', 'প্রাক-চেতন' ও 'অচেতন' তিনটি স্তর জুড়েই আছে 'ইগো' ও 'সুপার-ইগো'। অর্থাৎ এই ত্রি-প্রকোষ্ঠের মধ্যে সমগ্র 'ইদ', এবং 'ইগো' ও 'সুপার-ইগো'র বেশ খানিকটা অংশ মগ্নচৈতন্যের দখলীভূত। তবে একজন পরাবাস্তববাদী কবির সর্বোচ্চ আগ্রহের ক্ষেত্র মনের 'ইদ' প্রকোষ্ঠ। 'ইদ' হলো মানবমনের নিগূঢ়তম প্রকোষ্ঠ, যা তার সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) ও অবদমিত কামনা-বাসনার (the repressed) আধার। সুখ-সূত্র (pleasure-principle) দ্বারা চালিত এই অংশ পরস্পরবিরোধী কামনারাশির সমাহারে গঠিত। 'ইদ'-এর উপাদানগুলো কোনো যুক্তি দ্বারা চালিত হয় না। এতে না আছে 'না' বা 'নেতি'র (negation) কোনো অস্তিত্ব, আর না আছে 'কাল'-এর (time) কোনো ধারণা। ফ্রয়েড (1959: 02) লিখেছেন:

> We have arrived at our knowledge of this psychical apparatus by studying the individual development of human beings. To the oldest of these mental provinces or agencies we give the name of id. It contains everything that is inherited, that is present at birth, that is fixed in the constitution—above all, therefore, the instincts, which originate in the somatic organization and which find their first mental expression in the id in forms unknown to us.

মনঃসমীক্ষক কার্ল ইয়ুং ফ্রয়েডের স্তরীভূত ও প্রকোষ্ঠ ভিত্তিক মনের ধারণা থেকে সরে এসে বিবিধ তন্ত্রের সমাহারে গঠিত মনের ধারণা প্রদান করেন। তিনি 'সমষ্টি-অচেতন' (the collective unconscious) ধারণাটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে মানবমনের বিকাশ-প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে:

> মানব শিশু জন্মায় 'সমষ্টি-অচেতন' (the collective unconscious) মন নিয়ে। যা ক্রমে বিভিন্ন তন্ত্রে পৃথকীকৃত ও বিকশিত হয়। সমষ্টি-অচেতনের ব্যাপ্তিটি বিশাল। এতে যেমন রয়েছে প্রজাতি হিসেবে মানব প্রজাতির উদ্ভবের জান্তব স্মৃতি, তেমনি রয়েছে মানব ইতিহাসের সাংস্কৃতিক স্মৃতি। মানুষ হিসেবে আমরা যেমন একই রকম মস্তিষ্কের উত্তরাধিকারী, তেমনি একটি সমষ্টি-অবচেতনেরও উত্তরাধিকারী। মানব প্রজাতির এই জান্তব স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির ভাণ্ডারটিতে, স্মৃতিসমূহ বিভিন্ন 'আদি-প্রতিমা' (archetypes) আকারে সংরক্ষিত থাকে। (বিরঞ্জন ২০২১: ৭১-৭২)

এই 'সমষ্টি-অচেতন'কে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ব্যক্তির জন্মমুহূর্ত থেকে যাপিত-জীবনের যেসব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সে সচেতন নয়, তারই সমাকলনে সৃষ্ট 'ব্যক্তি-অচেতন' (the personal unconscious)। ইয়ুং ব্যক্তির সচেতন মনকে বলেছেন 'ইগো', যার ভিত্তিও 'সমষ্টি-অচেতন'। ইয়ুং-কথিত এই 'সমষ্টি-অচেতন' ও 'ব্যক্তি-অচেতন' উভয়ই আমাদের আলোচ্য মগ্নচৈতন্যের জগতের আওতাভুক্ত।

মনঃসমীক্ষক জাক লাকাঁ (১৯০১-১৯৮১) মানবমনকে ব্যাখ্যা করেছেন জ্যামিতিক টপলজির তলীয় ভাঁজ-খাঁজের রূপকে। লাকাঁনীয় তত্ত্বানুসারে অবচেতন মনের (যাকে আমরা মগ্নচৈতন্য বলে অভিহিত করছি) গঠন ভাষার মতো। ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর (১৮৫৭-১৯১৩) দেখিয়েছেন, ভাষায় ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ এক একটি চিহ্ন বা প্রতীক (sign)। এর দুটি দিক—একটি শব্দটির ধ্বনিগত গড়ন, অন্যটি এর ধারণাগত অর্থ। ধ্বনিগত গড়নটি হলো দ্যোতক (signifier) আর ধারণাগত অর্থটি দ্যোতিত (signified)। সীমিত সংখ্যক প্রথাগত অর্থসম্পন্ন শব্দদ্বারা (দ্যোতক) অসীম সংখ্যক বিভিন্ন মাত্রার ও ব্যঞ্জনার অর্থবোধ (দ্যোতিত) তৈরি হতে পারে ভাষা-কাঠামোতে। অনুরূপভাবে অবচেতনের কামনা-বাসনারাজিও দ্যোতক এবং তা নানা রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে দ্যোতিত হতে পারে। আর তা প্রকাশের মাধ্যম হলো ভাষা; একমাত্র ভাষার মাধ্যমেই অবচেতনের দ্যোতককে দ্যোতিত করা যায়। 'অবচেতনকে তখনই চেতনে আনা সম্ভব যখন অবচেতনের প্রতীকী রূপকে সমাজের গ্রাহ্য ভাষা-ব্যবস্থা-কাঠামোতে তুলে আনা সম্ভব।' অর্থাৎ, 'অবচেতন ভাষার আকারে গঠিত কিংবা অবচেতনের কোনো ভাষাহীন অস্তিত্ব নেই।' (মঈন ২০১৯: ১১৬)

স্বপ্ন ও বাস্তবের প্রচলিত বিরোধ অস্বীকার করে পরাবাস্তববাদীরা এক উচ্চতর বাস্তব বা অধিবাস্তব চেতনলোককে বাণীমূর্তি দানে সচেষ্ট হয়েছিলেন যেখানে মিলেমিশে এক হয়ে যায় চেতন-জগতের বাস্তব আর মগ্নচৈতন্যের রহস্য। আঁদ্রে ব্রেতঁর *Manifeste du surrealisme* অনুসারে পরাবাস্তববাদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে:

> Surrealism, n. Pure psychic automatism, by which one proposes to express, either verbally, in writing, or by any other manner, the real meaning of thought. Dictation of thought in the absence of all control exercised by reason, outside of all aesthetic and moral preoccupation. (উদ্ধৃত, খোন্দকার আশরাফ ২০১৩: ১৭৩)

ফ্রয়েডের তত্ত্বানুসারে মগ্নচৈতন্যের অতলান্তিক প্রদেশে প্রবেশ করার প্রধান উপায় ত্রিবিধ: সম্মোহন (hypnosis), অবাধ-অনুষঙ্গ (free association) ও স্বপ্ন (dream)। যেকোনো উপায়ে

মগ্নচৈতন্যের জগতে প্রবেশ করে তথাকার স্মৃতি-স্বপ্ন-বাসনারাজি তুলে আনতে চেয়েছিলেন পরাবাস্তববাদীরা। 'মনের উপর থেকে যুক্তির স্বৈরাচারী শাসনকে সরিয়ে ফেলে অন্তর্লীন গোপন সত্তাকে উদ্ধারের জন্য, 'Pure psychic automatism' অর্জনের উদ্দেশ্যে, তাঁরা মাদকের আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেননি' (অশ্রুকুমার ২০১৯: ৬৫৬)। স্বপ্নে যেমন মগ্নচৈতন্যের স্মৃতিপুঞ্জ উঠে আসে আপাত-অসংলগ্ন চিত্ররাশিরূপে, তেমনি পরাবাস্তব কবিতাও আত্মপ্রকাশ করে চেতন মনের যুক্তি-পারম্পর্যহীন স্বতঃব্যক্ত রচনা (automatic writing) হিসেবে। ভাষার ব্যাকরণ-শৃঙ্খলকে অগ্রাহ্য করে, প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে যুক্তিনির্ভরতা ও কার্যকারণ-সূত্রে গ্রথিত পারম্পর্যকে (logical sequence) তিরোহিত করে কবিতা রচনায় প্রয়াসী হন পরাবাস্তববাদীরা।

ফ্রান্সে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই আবির্ভাব ঘটে একঝাঁক পরাবাস্তববাদী কবির। আঁদ্রে ব্রেতঁ ছাড়াও এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি পল এলুয়ার (১৮৯৫-১৯৮৫), লুই আরাগঁ (১৮৯৭-১৯৮২), বেঞ্জামিন পেরে (১৮৯৯-১৯৫৯), রেনে ক্রেভেল (১৯০০-১৯৩৫), জাক বাঁর (১৯০৫-১৯৮৬), হান্স আর্প (১৮৮৬-১৯৬৬), আন্তনিন আর্তো (১৮৯৬-১৯৪৮), জাক প্রেভের (১৯০০-১৯৮৪), অঁরি মিশো (১৮৯৯-১৯৮৪) প্রমুখ। এছাড়াও জার্মান কবি মাক্স এর্নস্ত (১৮৯১-১৯৭৬), স্প্যানিশ কবি ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা (১৮৯৮-১৯৩৬) মগ্নচেতন মনের ব্যাপক ব্যবহার করেন তাঁদের কবিতায়। ইংরেজ কবি ডব্লিউ এইচ অডেন (১৯০৭-১৯৭৩), ডিলান টমাস (১৯১৪-১৯৫৩), টেড হিউজ (১৯৩০-১৯৯৮) এবং মার্কিন কবি রবার্ট ব্লাই (১৯২৬-২০২১), অ্যালেন গিন্সবার্গ (১৯২৬-১৯৯৭), রবার্ট ডানকান (১৯১৯-১৯৮৮) প্রমুখও পরাবাস্তব ভঙ্গিতে কবিতা রচনা করেছেন। পাশ্চাত্যের পরাবাস্তববাদী শিল্পান্দোলন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবিদেরও আকৃষ্ট করেছে। 'বাংলা কবিতায় সবচেয়ে পরাবাস্তবতাস্পৃষ্ট কবি জীবনানন্দ দাশ। বাংলাদেশের কবিতায় ষাটের দশকে একটি প্রবল সুররিয়ালিস্ট ধারার প্রবর্তন করেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। তিনি ছাড়া এই ধারায় কবিতা লিখেছেন সিকদার আমিনুল হক।' (খোন্দকার আশরাফ ২০১৩: ১৭২)

২

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) কবিতায় চেতন মনের সাথে মগ্নচেতন মনকে রসমূর্তি দানের প্রকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*-তেই। এ কাব্যের 'সেই ঘোড়াটা' কবিতায় রূঢ় বাস্তবতাময় চেতন জগতের নিষ্পেষণে পর্যুদস্ত কবির প্রতীক আস্তাবলের বেতো ঘোড়াটি কবিতার অন্তিমে পাড়ি জমিয়েছিল স্বপ্নময় মগ্নচৈতন্যের জগতে; আরো নির্দিষ্ট করে বললে মনের 'অচেতন' স্তরস্থিত 'ইদ' প্রকোষ্ঠে। মানুষের সকল ইচ্ছার উৎস এই প্রকোষ্ঠে প্রবেশের পর 'আশ্চর্য এক ফুল হয়ে/ জন্ম নিল তার ইচ্ছা, শিরায় শিরায়/ সঞ্চারিত হল সে ফুলের সৌরভ।' আর যেহেতু 'ইদ'-এ সময়ের ধারণা বলতে কিছু নেই তাই সেখানে প্রবেশের পর 'মুহূর্তে মুছে গেল সব সময়ের ব্যবধান,/ মেঘের বৈভবে সে ফিরে পেল তার অবলুপ্ত কান্তি'। 'চেতন', 'প্রাক-চেতন' ও 'অচেতনে'র মধ্যবর্তী সীমারেখাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে কবিতায় পরাবাস্তব জগৎ নির্মাণের এই কৌশল শামসুর রাহমান তাঁর

পরবর্তী বহু কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। রাহমানের কবিতায় পরাবাস্তব শিল্পপ্রকৌশল প্রয়োগের ইতিবৃত্তের নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন হুমায়ুন আজাদ (২০১৪: ১১২):

> বাস্তব ও পরাবাস্তবের ভীতিপ্রদ সঙ্গম ঘটে শামসুর রাহমানের তিনটি কবিতাগ্রন্থে: *আমি অনাহারী* [১৩৮২] ও *শূন্যতায় তুমি শোকসভা* [১৩৮৪: ১৯৭৭] ও *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখেতে* [১৩৮৪: ১৯৭৭]। বাস্তব-পরাবাস্তবের সুখ-সঙ্গম ঘটেছিল অনেক আগে, প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রগাদ্বিমৃত্যুর* [*প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*] 'সেই ঘোড়াটা'য়; আর এ-সম্মিলন অস্থিরতা-উন্মত্ততা-সঞ্চারী হ'য়ে উঠেছিল *দুমু* [*দুঃসময়ে মুখোমুখি*] ও *ফিনাঘাকায়* [*ফিরিয়ে নাও ঘতক কাঁটা*], এবং এ-গ্রন্থ তিনটিতে বাস্তব-পরাবাস্তবের নগ্ন মিলন হ'য়ে ওঠে পৌনঃপুনিক, রহস্যধুম্রমণ্ডিত, প্রতীক-রূপক-পরা ভীতিপ্রদ ঘটনা। প্রতিবেশপৃথিবীর ভারি চাপে ভেঙে যায় চৈতন্য ও মগ্নচৈতন্যের ব্যবধিপ্রাচীর, বস্তুবাস্তব-ভীতি-ক্ষুধা-ভরা প্রতিবেশ ঢুকে পড়ে শামসুর রাহমানের মগ্নচৈতন্যে, এবং মগ্নচৈতন্য, আপন জগতের রহস্য-উদ্ভটত্ব-ভীতি-দুঃস্বপ্ন স্তরে স্তরে সাজিয়ে, বেরিয়ে আসে বাইরে। ফলে এ কাব্য তিনটির প্রধান কবিতাগুচ্ছে বিলুপ্ত হয় চেতন-অবচেতনের ব্যবধান;—বাস্তব ভূভাগ পরে পরাবাস্তব সাজপোশাক, আর পরাবাস্তব ভূমণ্ডল হ'য়ে ওঠে সংহারী প্রতিবেশের প্রতিরূপ। *আজ* [*আমি অনাহারী*], *শূতুশো* [*শূন্যতায় তুমি শোকসভা*], *বাস্বদ্যার* [*বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে*] কবিতাসমূহ রচিত হয়েছে ১৯৭৪-১৯৭৭-এর মধ্যে;—এ-সময়ে শামসুর রাহমানের স্বদেশ, বাঙলাদেশ, রূপান্তরিত হ'য়ে গিয়েছিল এক পরাবাস্তব ভূখণ্ডে।

এ সূত্রেই আমাদের আলোচ্য শামসুর রাহমানের ত্রয়োদশতম কাব্যগ্রন্থ *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে*। অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই কাব্যের মতোই এ কাব্যের প্রধান প্রধান কবিতায়ও কবির চৈতন্য ও মগ্নচৈতন্য পরস্পর প্রবিষ্ট। আর্কাইভে যেমন সহজে বহন ও সংরক্ষণ করার জন্য একাধিক ডেটা ফাইলকে একক ফাইলে রূপান্তর করা হয় এবং কম সংরক্ষণস্থান ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ফাইলগুলোকে সংকুচিত করা হয়, তেমনি এ কাব্যের কবিতায় কবি আপন মগ্নচৈতন্যের জগতের দৃশ্যাবলিকে নিরেট গাঁথুনিতে সংহত কাব্যমূর্তি দান করেছেন। আর্কাইভ-সদৃশ সুসংবদ্ধ সংহতিতে ও প্রতীক-চিত্রকল্পের আলংকারিক পরিচর্যায় এ কাব্যে কবির মগ্নচৈতন্যের অনুভূতিরাশি হয়ে উঠেছে স্বপ্নপ্রতিম রূপসৃষ্টি। এখন আমরা *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে* কাব্যের প্রধান কয়েকটি কবিতা বিশ্লেষণ-সূত্রে উপর্যুক্ত বক্তব্যের সত্যতা যাচাইপূর্বক কাব্যে বিধৃত কবির মগ্নচৈতন্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পাব।

৩

'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' কবিতাটি সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ঘটনাসঞ্জাত। *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে* কাব্যের এ নামকবিতাটি কেবল এ কাব্যেরই শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়, বরং শামসুর রাহমানের সমগ্র কাব্যসম্ভারে এ কবিতাটির স্থান বিশিষ্ট। মাত্র অর্ধশত চরণবিশিষ্ট এ কবিতাটিকে, এর বিষয়গত মহিমা ও গঠনগত সংহতি-দৃষ্টে, একটি অষ্টাঙ্ক ট্র্যাজেডি বললেও অত্যুক্তি হয় না। শিরোনামে স্বপ্নের কথা থাকলেও সম্পূর্ণ কবিতাটি এর রচনাকালের মতোই দুঃস্বপ্নময়। কবিতাটি সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদের (২০১৪: ১১৯) পর্যবেক্ষণ:

> 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' নামী কবিতাটি অস্পষ্ট, রহস্যমণ্ডিত, বাস্তব-পরাবাস্তবের মিশ্রণে উদ্ভট; তবু আমি বোধ করি এ-কবিতাটি ১৯৭৫-এর আগস্টীয় দুর্ঘটনাজাত। কবিতাটিতে বাস্তবতা রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে, মাঝেমাঝে মনে হয় সুস্পষ্ট বাস্তবতাকে বুঝি পাওয়া গেল, কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তেই উদ্ভট, অচেনা বিভীষিকাজাগানো চিত্রকল্পরাশি উপস্থিত হয়। কবিতাটিতে স্থান পেয়েছে বাঙলাদেশের আটটি প্রধান, এবং প্রধান স্বপ্নের অনুষঙ্গে গ'ড়ে ওঠা কয়েকটি অপ্রধান, স্বপ্ন, যে-গুলো আপাদশির দুঃস্বপ্ন।

চার স্তবকবিশিষ্ট কবিতাটিতে 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' শব্দবন্ধ পৌনঃপুনিক আটবার ব্যবহৃত হয়েছে। তাই কবিতায় আপাতভাবে আটটি স্বপ্ন আছে বলেই মনে হয়। কিন্তু কবিতাটির অন্তর্ভেদী অবলোকনে প্রতীয়মান হয়, সমগ্র কবিতাটি একটি একক ঘটনারই কার্যকারণ, বিবরণী ও ফলশ্রুতি। বর্ণিতব্য ঘটনাকে স্বপ্নের আঙ্গিক প্রদানের উদ্দেশ্যেই কবি একটি অচ্ছিন্ন ঘটনাকে বিখণ্ডিত করে স্তবকে স্তবকে বিন্যস্ত করেছেন। কারণ আপাতভাবে পরস্পরবিচ্ছিন্ন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরস্পর সম্পর্কিত দৃশ্যাবলি নিয়েই একটি স্বপ্ন গঠিত হয়। তাই এখানে আট বা ততোধিক স্বপ্নের উপস্থিতি কল্পনার পরিবর্তে আট বা ততোধিক দৃশ্য সংবলিত বাংলাদেশের দেখা একটি অখণ্ড স্বপ্ন বর্ণিত হয়েছে বললেই কবিতাটির আত্যন্তিক সংসক্তি অক্ষুণ্ন থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

কবিতাটি নিঃসন্দেহে '১৯৭৫-এর আগস্টীয় দুর্ঘটনাজাত'; তবে 'অস্পষ্ট, রহস্যমণ্ডিত, বাস্তব-পরাবাস্তবের মিশ্রণে উদ্ভট' নয় মোটেই। অস্পষ্টতা ও রহস্য আছে কিন্তু তা কথাকে কবিতা করে তুলতে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই, তার মাত্রা এত বেশি নয় যে তা কবিতাটিকে উদ্ভটত্ব প্রদান করে। বস্তুত 'সংক্ষেপণ' (condensation), 'অভিক্রান্তি' (displacement) ও 'প্রতীকী প্রদর্শন পদ্ধতি' (representation) প্রভৃতি স্বপ্ন-গঠনকৌশলের সার্থক প্রয়োগের ফলে কবিতাটি আপাতদৃষ্টে উদ্ভট মনে হয়। ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব অনুসারে স্বপ্ন অর্থহীন, উদ্ভট কোনো ব্যাপার নয় বরং স্বপ্ন মানুষের মগ্নচেতন মনের অর্থপূর্ণ ক্রিয়াকলাপেরই বহিঃপ্রকাশ। ফ্রয়েড (1913: 103) লিখেছেন:

> The dream is not comparable to the irregular sounds of a musical instrument, which, instead of being touched by the hand of the musician, is struck by some outside force; the dream is not senseless, not absurd, does not presuppose that a part of our store of ideas is dormant while another part begins to awaken. It is a psychic phenomenon of full value, and indeed the fulfilment of a wish; it takes its place in the concatenation of the waking psychic actions which are intelligible to us, and it has been built up by a highly complicated intellectual activity.

বাংলাদেশের দেখা স্বপ্ন হিসেবে কবিতায় যে পরাবাস্তব দৃশ্যাবলি উপস্থাপিত হয়েছে, তার উৎস মূলত মগ্নচৈতন্যের জগৎ। শামসুর রাহমানের অপরাপর পরাবাস্তব কবিতার অবলম্বন তাঁর আপন মগ্নচৈতন্য তথা ইয়ুং-কথিত 'ব্যক্তি-অচেতন' হলেও এই কবিতায় কবি তাঁর স্বদেশ তথা স্বজাতির সামূহিক মগ্নচৈতন্য তথা 'সমষ্টি-অচেতন'কে স্বপ্নপ্রতিম বাণীরূপ দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড কবির নির্জ্ঞানে যে অভিঘাতের সৃষ্টি করেছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ

ঘটেছে কবিতাটিতে। চেতন জগতের যুক্তিশৃঙ্খলকে অবলুপ্ত করে দিলেও কবিতাটিতে কবি কতিপয় চাবিশব্দ রেখে দিয়েছেন, যার সাহায্যে কবিতাদুর্গের দ্বার খুলে কবিতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করা সম্ভব। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের ইতিহাস, মানব-মগ্নচৈতন্যের ভূগোল এবং কবিতারাজ্যের পৌরনীতি জানা না থাকলে সেই চাবির সন্ধান-প্রাপ্তি দুরূহ। কবিতার প্রথম স্তবকে আছে এক বৃহদাকার নিশ্চল ব্রোঞ্জমূর্তির মৃত্তিকাভেদী উত্থানের চিত্রকল্প:

> বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি, নিথর বিশাল,
> মাটি ফুঁড়ে জেগে ওঠে গভীর রাত্তিরে!
> মুখে শতাব্দীর গাঢ় বিশদ শ্যাওলা আর ভীষণ ফাটল,
> যেন বেদনার রেখা। ব্রোঞ্জের অদ্ভুত চক্ষুদ্বয় খুব স্থির
> চেয়ে থাকে অন্ধকারে; মনে হয়, ওরা কোনো দিন
> দ্যাখেনি কিছুই,
> যদিও দ্যাখার কথা ছিল শতাব্দীর মতোই ব্যাপক বহু কিছু।
> কী যেন বলতে চায় সেই মূর্তি, কণ্ঠস্বর তার স্তব্ধতায়
> টোকা দিতে চেয়ে
> হাওয়ায় হারায়, দুটি হাত বুঝি ধরে রেখেছে অতীত কিছু।
> ব্রোঞ্জমূর্তি প্রশ্ন চিহ্ন, উত্তরবিহীন; ঘাস ক্ষিপ্র চাটে তার পদযুগ। (শামসুর ২০০৮: ৪১১)

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ঘটনার অব্যবহিত পরে রচিত কবিতা হিসেবে বাংলাদেশের মগ্নচৈতন্যের মাটি ফুঁড়ে ওঠা এই ব্রোঞ্জমূর্তিটি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিমূর্তি, প্রথম পাঠে এমন প্রতীতিই জন্মে। কিন্তু 'ব্রোঞ্জের মূর্তি, নিথর বিশাল' ও 'দুটি হাত বুঝি ধরে রেখেছে অতীত কিছু' অংশদ্বয় সেই বিশ্বাসে ভাঙন ধরায়। কারণ প্রথমত, বাংলাদেশসহ সমগ্র দক্ষিণ এশীয় সমষ্টি-অচেতনে বিশাল ব্রোঞ্জমূর্তির অবয়ব বুদ্ধমূর্তির প্রত্নপ্রতিমাকে সমধিক উজ্জ্বল করে। এ অঞ্চলে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের বিশালাকার মূর্তির প্রায় সবগুলোই বুদ্ধমূর্তি। পক্ষান্তরে ১৯৭৭-পূর্ব সময়ে সদ্য নিহত বঙ্গবন্ধুর বিশালাকার ব্রোঞ্জমূর্তি বাঙালির মগ্নচৈতন্যে গেঁথে যাওয়া কল্পনাতীত। দ্বিতীয়ত, 'দুটি হাত বুঝি ধরে রেখেছে অতীত কিছু' বাক্যাংশ বাঙালিমাত্রেরই চৈতন্যে বুদ্ধমূর্তির দুই হাত নাভিমূলে ধারণকৃত 'সমাহিত' বা 'ধ্যান' মুদ্রার অবয়বকেই জাগ্রত করে; বঙ্গবন্ধুর ডান হাতের তর্জনি উত্থিত যে প্রতিমূর্তি বাঙালির মানসে প্রোজ্জ্বল তার সঙ্গে কবিতায় বর্ণিত ব্রোঞ্জমূর্তির অবয়বের কোনো সুদূরতম সাদৃশ্যও নেই। তৃতীয়ত, বুদ্ধমূর্তি রাহমানের কবিতার একটি পুনরাবৃত্ত প্রতীক। যেমন *শূন্যতায় তুমি শোকসভা* কাব্যের 'এমন থাকতে পারি' কবিতায় তিনি বুদ্ধমূর্তিকে ব্যবহার করেছেন স্থৈর্যের প্রতীক হিসেবে: 'এমনও থাকতে পারি আমি.../ দীর্ঘকাল এই মতো অস্থিরতা-রহিত সর্বদা/ অবচেতনার ঘরে অপেক্ষায় বুদ্ধমূর্তি প্রায়।' (শামসুর ২০০৮: ৩৮২)

কবিতার পরবর্তী অংশে গ্রথিত হত্যাযজ্ঞের উপক্রমণিকা-স্বরূপ কবি প্রথম স্তবকে নিশ্চল নিশ্চুপ বুদ্ধমূর্তির অবতারণা করেছেন। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন অহিংসা-নীতির প্রচারক। বৌদ্ধধর্মের ধর্মাচারের অন্যতম অনুষঙ্গ 'পঞ্চশীলে'র প্রথমটিই হলো 'প্রাণিহত্যা পরিহার'। অথচ বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ তথা বাঙালির অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা হয়েছে দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের সহিংস কর্মকাণ্ডসহ অগণিত

হত্যাযজ্ঞের দুঃসহ স্মৃতি। তাই কবিতার বুদ্ধমূর্তির 'মুখে শতাব্দীর গাঢ় বিশদ শ্যাওলা আর ভীষণ ফাটল'। পঁচাত্তরের বাংলাদেশে বিরাজমান 'গভীর রাত্তিরে'র তমসাচ্ছন্নতার দিকেই স্থির চোখে চেয়ে থাকেন মহান বুদ্ধ তাঁর প্রচারিত অহিংসা-নীতির চরম অবমাননা প্রত্যক্ষ করে। বুদ্ধের প্রতিমূর্তি কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারেন না, হাওয়ায় মিলিয়ে যায় তাঁর কণ্ঠস্বর। আগস্টের হিংসাত্মক নিধনযজ্ঞ বুদ্ধ-আদর্শকেই যেন এক উত্তরবিহীন প্রশ্নচিহ্নে পরিণত করেছিল।

বাইরের যেসব উদ্দীপকের প্রভাবে স্বপ্নের সৃষ্টি হয়, স্বপ্নে ঠিক সে বস্তুই দেখা যায় না, দেখা যায় অন্য কিছু। স্বপ্নে মগ্নচৈতন্যের বিষয়াবলি প্রকাশ পায় নানা প্রতীকের আশ্রয়ে। কবিতায় বর্ণিত স্বপ্নের দ্বিতীয় দৃশ্যে কবি সদ্যোজাত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিস্থাপক প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন দাবদাহে আশ্রয়হারা এক ভীত-সন্ত্রস্ত হরিণীকে:

> বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে বনপোড়া একটি হরিণী
> ছোটে দিগ্বিদিক, তীব্র তৃষ্ণায় কাতর; জলাশয়ে মুখ রেখে
> মরুর দুরন্ত দাহ মেখে নেয় বুকে এবং আপনকার
> মাংস আর হাড়ের ভেতরে
> সে ঘুমায় নিরিবিলি। (শামসুর ২০০৮: ৪১১)

স্বপ্নে বাংলাদেশ হরিণীর প্রতীকে নিজেকেই প্রত্যক্ষ করে, যে কিছুদিন পূর্বেই মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসব্যাপী দাবানলের শিকার হয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলা বনপোড়া হরিণীর মতোই আশ্রয়ের আশায় দিশেহারা হয়ে দিগ্বিদিক ছুটছিল যুদ্ধপরবর্তী দিনগুলোতে। যুদ্ধকালীন ধ্বংসযজ্ঞের উপজাত যুদ্ধপরবর্তী বাংলার অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চিত্রই আছে এ স্বপ্নাংশটিতে। তবু, বাংলার এমন অস্থির পরিবেশের পটভূমিতেও 'মাংস আর হাড়ের ভেতরে/ সে ঘুমায় নিরিবিলি', যা বাংলার সাধারণ প্রকৃতিগত ধর্ম।

তৃতীয় দৃশ্যে হরিণীর প্রতীক পরিত্যাগ করে কবি বাংলাদেশের প্রতিস্থাপক প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেন একটি জুয়ার টেবিল। কারণ এখন দেশ আর সেই ভীত হরিণীটি নেই, একদল স্বার্থান্বেষী তাকে পরিণত করেছে জুয়ার টেবিলসদৃশ নীতিহীন স্বর্থোদ্ধারের ক্রীড়া ক্ষেত্রে। এই জুয়ার টেবিলে স্বার্থান্ধ জুয়াড়িরা তাদের স্বার্থের সিদ্ধি অর্জনে পরিকল্পনারত:

> বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে—জুয়ার টেবিলে
> সহসা নক্ষত্র ঝরে, সন্ত সন্ত বলে জুয়াড়ীরা
> শূন্যের উদ্দেশে
> তোলে হাত, কখন যে হাত বেয়ে সাপ নেমে আসে,
> কিছুতে পায় না টের, ভাবে দ্রাক্ষালতা জীবনের
> ওষ্ঠে দেবে ফেলে কিছু সোনালি মদিরা বেলাবেলি। (শামসুর ২০০৮: ৪১১)

বাংলাদেশের প্রতীক জুয়ার টেবিলে জুয়াড়িরা সাধু সাধু বলে যে হাত উর্ধ্বে তুলেছিল শূন্যের উদ্দেশে, তা বেয়ে নেমে আসে সাপ। সাপ এখানে যুগপৎ বিশ্বাসঘাতকতা ও হিংস্রতার প্রতীক। ফ্রয়েড সাপকে পুং জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করলেও বাঙালি-চৈতন্যে

সাপ কৃতঘ্নতার আর্কেটাইপ।[৩] এই হিংস্র বিশ্বাসঘাতকতার মোটিফ উল্লেখ করতেও কবি ভুল করেন না। জুয়াড়িরা 'ভাবে দ্রাক্ষালতা জীবনের/ ওষ্ঠে দেবে ফেলে কিছু সোনালি মদিরা বেলাবেলি।'

স্বপ্নের চতুর্থ দৃশ্যে দেখা মেলে মধ্যরাত্রির এক শহরের। এ শহর নিশ্চিতভাবেই ঢাকা, কেননা রাহমানের কবিতার ভূগোল জুড়ে ঢাকা শহরই সর্বাধিক দীপ্যমান। ফ্রয়েড আবিষ্কার করেছেন স্বপ্ন মানুষের ইচ্ছা, কল্পনা, ধারণা ইত্যাদিকে 'বিকৃত' (distortion) করে প্রকাশ করে; মনের প্রকৃত বস্তু বা ভাবটিকে অনুকরণ করে না। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার নিতান্ত অপ্রিয় কোনো জিনিসও স্বপ্নে তার খুব প্রিয় হয়ে উঠতে পারে। স্বপ্নের চতুর্থ দৃশ্যটি ফ্রয়েড-কথিত 'বিকৃতি'র উদাহরণ। এ অংশে ইট-পাথরের যান্ত্রিক শহরে গাঙচিলরূপী নাবিকসমেত সুনীল জাহাজের আগমনে যেন সামুদ্রিক প্রশান্তি নেমে আসে। কিন্তু কবি যে সুনীল জাহাজ ও তার গাঙচিলরূপী নাবিকদের কথা বলেছেন তা ব্যাজস্তুতিমূলক। আপাত মনোরম দৃশ্যের অন্তরালে প্রোথিত আছে এক ভীতিজাগানিয়া রাতের বিবরণ:

> বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে—মধ্যরাত্রির শহরে এক
> সুনীল জাহাজ
> সহজে প্রবেশ করে, নাবিকেরা গাঙচিল হয়ে
> কলোনির, বাণিজ্যিক এলাকার ছাদে ছাদে ওড়ে,
> একজন অন্ধ, ক্রূর, বণিকের হাতে বাজপাখি;
> নগর পুলিশ অর্ফিয়ুস না কি বলে কেউ কেউ
> করোটিতে তবলা বাজায়। (শামসুর ২০০৮: ৪১১)

স্বপ্নের সুনীল জাহাজ, তার নাবিকেরা, বাজপাখি হাতে ক্রূর বণিক সবগুলোই এক একটি প্রতীক। এই প্রতীকগুচ্ছের সম্ভাব্য নির্দেশ্যগুচ্ছ হতে পারে যথাক্রমে ঘাতকদলের ট্রাক-জিপ-ট্যাঙ্ক, ঘাতকদের অনুসারী এবং এই হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী। 'করোটি' রাহমানের কবিতায় 'মৃত্যু-অনুষঙ্গ-জড়িত চিত্রকল্প'সমূহের একটি (হুমায়ুন ২০১৪: ১৮৩)। *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যে কবি মধ্যবিত্তের করোটিতে শেষ পর্যন্ত রৌদ্র ঝলসে উঠতে দেখেছিলেন। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। সংগীতের মূর্ছনায় জীবজন্তু এমনকি পাথরকে আকর্ষণ করার ক্ষমতার অধিকারী গ্রিক পৌরাণিক চরিত্র অর্ফিয়ুস যেন মৃত্যুদূতকে ডেকে এনেছে রাতের নগরে আর মৃত্যু যেন তবলা বাজিয়ে উদ্‌যাপন করার মতো বীভৎস উৎসবে পরিণত হয়েছে।

চতুর্থ দৃশ্যের পর স্তবক ভেঙে কবি যখন নতুন স্তবকে যান ততক্ষণে হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। স্বপ্নের পঞ্চম দৃশ্যে আভাসিত হয় হত্যাপরিকীর্ণ বাসভবনের চিত্র:

> বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে মৃত শিশু মেঘে ভাসমান ক্ষমাহীন,
> কার্পেটের তলা থেকে, জানালার পুরু পর্দা থেকে,
> টেলিগ্রাম আর কিছু পুরোনো চিঠির তাড়া থেকে
> এবং মাছের পেট থেকে নারী আর শিশু আসে ভেসে ভেসে,
> মেহেদি পাতার ভিড় থেকে, বেলুনের ঝাঁক থেকে
> নারী আর শিশু ভেসে আসে। (শামসুর ২০০৮: ৪১১-৪১২)

সে রাতের হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি নারী বা শিশুও। স্বপ্নের এ অংশে কার্পেট, জানালার পর্দা, টেলিগ্রাম, চিঠির তাড়া, মাছের পেট, মেহেদি পাতা ও বেলুনের ঝাঁক থেকে ভেসে আসা শিশু ও নারীদের শনাক্ত করতে বেগ পেতে হয় না। মেঘে ভাসমান ক্ষমাহীন মৃত শিশু শেখ রাসেলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মেহেদি পাতার উল্লেখ শেখ কামাল ও শেখ জামালের নববধূ, যাঁদের হাতের মেহেদির রং তখনও মুছে যায়নি, সেই সুলতানা কামাল ও রোজি জামালেরই ইঙ্গিতবাহী। প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান: 'মিসেস রোজী জামাল সদ্য বিবাহিতা, হাতে তাজা মেহেদীর রং। ব্রাস অথবা গ্রেনেডের আঘাত সরাসরি তার মুখে লেগেছিল। ভাগ্যিস তার প্রিয়জন কাউকে তার চেহারা দেখতে হয়নি' (হামিদ ২০১৭: ৬৩)। মুজিব-হত্যার অব্যবহিত পরের চিত্র ষষ্ঠ দৃশ্যের উপজীব্য:

> বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে
> পতাকার নিচে কত আহত প্রেমিক নতজানু
> গোধূলিতে, চতুর্দিকে উন্মাদের পদধ্বনি, কার সে বাঁশিতে
> নস্টালজিয়ার মতো সুর, কী সুন্দর প্রাণী পথের ধুলায়
> বিকলাঙ্গ, ক্লাউনের টুপি সবুজ ঘোড়ার পায়ে পায়ে ঘোরে,
> ক্লাউন কফিনে ব'সে পিট পিট চেয়ে থাকে ভীষণ একাকী।
> বৃষ্টি পড়ে রঙ-করা গালে তার, বৃষ্টি পড়ে মৃত্যুর পাহাড়ে। (শামসুর ২০০৮: ৪১২)

স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় যে গোধূলিলগ্ন ঘনিয়ে এসেছিল বাংলাদেশে, তাতে বাঙালি পুনর্বার নতমস্তক হতে বাধ্য হলো। স্বার্থোন্মাদদের পদতলে পিষ্ট হলো বাংলার স্বাধীনতা। 'ক্লাউন' রাহমানের কবিতায় বরাবরই মহিমা প্রকাশক প্রতীক।[৪] উদ্ধৃত কবিতাংশে 'ক্লাউন' শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতীক। হত্যার পর 'শেখ সাহেবের লাশ কফিন বন্দি করে বারান্দার এক কোণে একাকী ফেলে রাখা হয়েছিল' (হামিদ ২০১৭: ৬৬)। এখানে বৃষ্টি কোনো প্রশান্তিদায়ক নৈসর্গিক উপাদান নয়, দুর্যোগের প্রতীক। মৃত্যুর যে পাহাড় তৈরি হয়েছিল সে রাতে তাতে বৃষ্টিপাত ওই বিষাদকে যেন আরো তীব্র, আরো ঘনীভূতই করে।

স্বপ্নের সপ্তম দৃশ্যে আছে পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের চিত্র। মুজিব-হত্যার পর স্বার্থান্বেষী মহলের কদর্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল, তারই পরিচয়বাহী এ স্বপ্নাংশ:

> বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে—কতিপয় লোক দেবদূতের নগ্নতা
> বড় বেশি কাম্য ভেবে উন্মাদের মতো নগ্ন হয়ে যায়,
> তরুণীর ওষ্ঠে বারবার চুমো খায় কর্কশ কঙ্কাল আর
> লোহিত বনের ধারে পাথরের ঘোড়ায় সওয়ার
> অত্যন্ত পাথুরে যোদ্ধা, স্তব্ধ অস্ত্রে চির-জ্যোৎস্না বয়। (শামসুর ২০০৮: ৪১২)

যে তরুণীর ঠোঁটে কর্কশ কঙ্কাল চুম্বন করছে সে তরুণী নতুন জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতীক। কর্কশ কঙ্কালরূপী অপশক্তি তার সকল লাবণ্য ওষ্ঠচুম্বনের মাধ্যমে নিঃশেষে শুষে নিতে ব্যস্ত। আর জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধারা আজ স্থাবর পাথুরে যোদ্ধায় পরিণত

হয়েছেন, তাঁদের হাতের অস্ত্রও আজ স্তব্ধ। প্রতীকের আশ্রয়ে এ স্বপ্নাংশে মুজিব-হত্যার পর ঘাতকদের কর্ম এবং তার সমান্তরালে বাঙালির, বিশেষত কয়েক বছর পূর্বেই পাকিস্তানি জান্তার বিরুদ্ধে যাঁদের হাতে অস্ত্র গর্জে উঠেছিল, সেই মুক্তিযোদ্ধাদের নির্লিপ্ততা প্রকাশিত হয়েছে।

স্বপ্নের শেষ দৃশ্যে কবি বাঙালির 'সমষ্টি-অচেতন' থেকে আহরিত রূপকথার আঙ্গিককে ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত মুক্তির জন্য প্রতীক্ষারত বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরেছেন:

> বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে একজন অসুস্থ নৃপতি শয্যাশায়ী
> একটি সোনালি খাটে, অলৌকিক ফলের আশায়
> প্রহর ফুরায়, তাহলে কি দীপ নিভে যাবে গহন বেলায়?
> কোন তেপান্তরে আজ হাঁপাচ্ছে বিশীর্ণ পক্ষীরাজ,
> ভাবেন নৃপতি, চোখ বুজে আসে, তৃতীয় কুমার তাঁর এখনও ফেরেনি! (শামসুর ২০০৮: ৪১২)

তৃতীয় কুমারের অলৌকিক ফলের প্রত্যাশায় সোনার বাংলারূপ সোনালি খাটে মুমূর্ষু অবস্থায় ধুঁকছেন যে শয্যাশায়ী নৃপতি, তিনি প্রতীক্ষারত বাংলাদেশিদের প্রতীক। কিন্তু মুক্তির দূত তৃতীয় রাজকুমার আজও অনাগত। *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যের 'সেই ঘোড়াটা' কবিতার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র আছে এখানে। ওই কবিতায় আস্তাবলের বেতো ঘোড়াটি শেষাবধি পক্ষীরাজ হয়ে উড়ে গিয়েছিল স্বপ্নময় জগতে, আর এই কবিতায় তৃতীয় কুমারের বিশীর্ণ পক্ষীরাজ ঘোড়াটি তেপান্তরের মাঠে পড়ে হাঁপাচ্ছে। তার সুস্থ হয়ে ওঠার দূর-সম্ভাবনাও দেখা যায় না কবিতার শেষে। এভাবে এক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই অবসান ঘটে বাংলাদেশের দেখা এই দুঃস্বপ্নের।

'অপরাহ্ণে একদল মিউজিসিয়ান' কবিতায় কবি তাঁর আপন মনের 'ইদ' প্রকোষ্ঠে গুহায়িত স্বপ্নময় বাসনারাজিকে তুলে এনেছেন কতিপয় প্রতীকের আশ্রয়ে। কবিতায় তিনি যে শহরের কথা বলেছেন, অপরাহ্ণে যার গলির মোড়ে একদল গীতবাদ্যকার ড্রাম, ক্ল্যারিওনেট, স্যাক্সোফোন, ভায়োলিন, ট্রাম্পেট প্রভৃতি রকমারি বাদ্য বাজিয়ে কনসার্ট করে শহরটিকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করে দেয়, সেই শহরের সন্ধান বস্তুপৃথিবীর ভূগোলে মিলবে না। সে শহর কবির মগ্নচৈতন্যের শহর। কবির মগ্নচৈতন্যস্থিত এ শহরের মিউজিসিয়ানরা তাঁর অবদমিত কামনা-বাসনার প্রতীক; ইয়ুংয়ের তত্ত্বানুসারে কবির জৈব প্রবৃত্তিসমূহের (the shadow) প্রতীক। তাই মগ্নচৈতন্যের সেই মিউজিসিয়ানদের খাদ্য, সুখ, স্বপ্ন, ছুটি, বেতন, ডেরা ইত্যাদি বিষয়ক কোন প্রশ্ন ওঠে না, ওঠা নিরর্থক। কবি তাদের পরিচয় দেন রুশ চিত্রশিল্পী মার্ক শাগালের (১৮৮৭-১৯৮৫) চিত্রের উপমায়:

> মিউজিসিয়ানগণ শাগালের ছবির মতন—কেউ কেউ
> ভাসমান, সঙ্গে ঘোড়া অথবা বাছুর, ভায়োলিন
> মালাসহ দোলে, কেউ পথে শোয়ানো লোকের পাশে
> দাঁড়িয়ে চাঁদের নিচে ব্যাঞ্জো নিয়ে মাতে, গান গায়! (শামসুর ২০০৮: ৪২২)

এখানে শূন্যে ভাসমান মিউজিসিয়ানগণ কবির যৌন উদ্দীপনার প্রতীক;[৫] ভায়োলিন, ব্যাঞ্জো প্রভৃতি পুং জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক;[৬] আর মিউজিসিয়ানদের ভায়োলিন বা ব্যাঞ্জো বাজানো কবির আত্মশৃঙ্গারের প্রতীকী রূপায়ণ।[৭] তবে এই আত্মশৃঙ্গারে কবির 'ইদ'-এর সুখান্বেষী উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয় না, তাই:

> ড্রাম চায় জ্বলজ্বলে দুই বিঘা জমি,
> স্যাক্সোফোন অরণ্যের অন্তর্গত স্বপ্নের প্রপাত,
> এবং ক্ল্যারিওনেট চায় যাবতীয় কমলালেবুর
> বাগানের একান্ত দখলীস্বত্ব আর
> ভায়োলিন চায় স্তব্ধ নদীতীর, কবিতার বর্ণিল টেরেসে,
> সোনালি ট্রাম্পেট চায় একগুচ্ছ সতেজ গোলাপ,
> ব্রাউন গিটার চায় তারে তারে সুন্দরীর ঘুমন্ত শরীর। (শামসুর ২০০৮: ৪২২)

'নিজের কামনারাশি শামসুর রাহমান, এই পংক্তিসমূহে, পরিণত করেছেন বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের কামনায়, এবং এতে বাস্তবতার সঙ্গতি বিনষ্ট হ'য়ে দেখা দিয়েছে মনোবাস্তবের সঙ্গতি' (হুমায়ুন ২০১৪: ১২০)। ড্রাম, স্যাক্সোফোন, ক্ল্যারিওনেট, ভায়োলিন, ট্রাম্পেট, গিটার প্রভৃতি স্পষ্টত পুং জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক। এসব বাদ্যযন্ত্রের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহের মধ্যে কেবল সুন্দরীর ঘুমন্ত শরীর প্রতীকহীনভাবেই প্রকাশিত; এছাড়া জমি, অরণ্য, কমলালেবু, নদী ও গোলাপ যথাক্রমে নারীর জরায়ু, যৌনকেশ, স্তন, যোনিমুখ ও কুমারীত্বের প্রতীক।[৮]

মনের কোনো আবেগ বা ইচ্ছা যদি বাস্তবতা বা প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির পরিপন্থী হয় তাহলে মানবমন তাকে বলপূর্বক অবদমিত করে চেতন স্তর থেকে অচেতন স্তরে ঠেলে দেয়। কিন্তু অবদমিত হলেও সেইসব বাসনা অচেতন স্তরে গিয়ে একেবারে মুছে যায় না। অবদমিত ইচ্ছা অনেক সময় নিজ থেকেই বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে। এগুলো অবদমিত হলেও 'ইদ' এগুলোকে পুনরায় চেতন স্তরে পাঠাতে চায় চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। 'ইদ' নিরবচ্ছিন্নভাবে এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু 'ইগো' যখনই 'ইদ'-এর এই প্রচেষ্টা লক্ষ করে তখনই পুনরায় সেসব বাইরে আসা অবদমিত ইচ্ছাগুলোকে অচেতনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ঠেলে দেয়। অবদমিত ইচ্ছাগুলো অচেতন থেকে বাইরে এসে চেতন স্তরে আসার পথে ইগোর এই প্রকার বাধা সৃষ্টি করাকে প্রতিবন্ধক (resistance) বলা হয়। কবিতার পরবর্তী স্তবকে আছে এই মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার প্রতীকী রূপায়ণ:

> তিনটি বিয়ার ক্যান শহরের অনেক ওপরে, প্রায় মেঘমালা
> ছুঁয়ে তীব্র মরুঘ্রাণ নিয়ে এ শহরে অবেলায়
> কোত্থেকে হঠাৎ এক ভিড় উট এসে মিউজিসিয়ানদের
> উদ্ভট ভঙ্গিতে দূরে, বহুদূরে হটাতে হটাতে
> খাদের কিনারে নিয়ে যায়
> বিরান প্রান্তর থেকে, খাদের কিনার থেকে ফের
> অপরাহ্ণে ফিরে আসে একদল মিউজিসিয়ান। (শামসুর ২০০৮: ৪২২)

উট এখানে কবির 'ইগো'র প্রতীক। বিশেষ কোনো মুহূর্তে কবির মনের বাসনারাজি তথা মিউজিসিয়ানগণ বেরিয়ে আসে। কিন্তু কবির 'ইগো' পুনরায় সেসব বাইরে আসা অবদমিত ইচ্ছাগুলোকে অচেতনে ঠেলে দেয়। উল্লেখ্য 'তিন' সংখ্যাটিও পুং জননেন্দ্রিয় বোঝায়। কবিতার এ পর্যায়ে এসে সংশয়ে বিদ্ধ হন কবি, 'বাস্তবিকই একদল মিউজিসিয়ান এসেছে এখানে অপরাহ্নে?' কারণ ইতোমধ্যে মগ্নচৈতন্যের দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। এখন কবি তাঁর মনের অতলান্তে দৃষ্টিপাত করে প্রত্যক্ষ করেন মৃত্যুপুরীসদৃশ এক বিধ্বস্ত নগরী:

আমিতো দেখছি আজরাইল রাশি রাশি ইশতাহার
বিলি করে অলিতে গলিতে,
চৌরাস্তায়, বাস টার্মিনালে এবং চালান করে কালো চুমো
ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে, বেঘোর বস্তিতে।
কতিপয় কফিনের পাশে স্যাক্সোফোন, ট্রাম্পেট, গিটার আর
ভায়োলিন পড়ে আছে। তবে কি সকল স্পন্দমান
মিউজিসিয়ান মৃত? শত শত রক্ত মাখা ইঁদুর এখানে
ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ সারাবেলা
সে কোন মড়কে গেল মুছে জরিগাঁথা ঝলমলে
পোশাকে-আশাকে মোড়া টেরিকাটা মিউজিসিয়ান? (শামসুর ২০০৮: ৪২২-৪২৩)

স্বপ্নময় বাসনারাজির অন্তর্ধানে কবির মগ্নচৈতন্যের শহরে এসে ভীড় করেছে ভীতিকর স্মৃতিরাশি। কবির মগ্নচৈতন্যের পর্দায় তাই ভেসে ওঠে একের পর এক বীভৎস দৃশ্য। কিন্তু কবিতার অন্তিম স্তবকে এসে কবি হয়তো তাঁর বাসনার চরিতার্থেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন:

ভাবতে ভালোই লাগে
মিউজিসিয়ানগণ এ শহরে সুর তোলে যখন তখন,
ভাবতে ভালোই লাগে,
সেই সুরে এক ঝাঁক কবুতর স্বপ্নের ভগ্নাংশ হয়ে যায়,
ভাবতে ভালোই লাগে
সেই সুরে সূর্যমুখী আর দীপ্র সিংহের সম্প্রীতি
নেচে ওঠে গহন দুপুরে,
সেই সুরে সব বাড়ি হেঁটে যায় কবিতার পঙ্‌ক্তির মতন। (শামসুর ২০০৮: ৪২৩)

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক সূর্যমুখী ফুল আর উদ্দীপ্ত পুরুষের প্রতীক সিংহের সম্প্রীতি ও নৃত্য সম্ভবত রতিকর্মকেই ইঙ্গিত করে।[৯]

ঢাকার নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের আত্মজৈবনিক বর্ণনা ও দীর্ঘ তালিকা প্রণয়নে 'হ্যাঁ' কবিতাটি একান্তই শামসুর রাহমানীয় হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *রৌদ্র করোটিতে* থেকেই এই ভাব ও ভঙ্গি রাহমানের কবিতায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। তবে একই ভাব ও ভঙ্গির অন্যান্য কবিতা থেকে এ কবিতাটির স্বাতন্ত্র্য আছে। এটির বিশেষত্ব হলো, সমকালীন নাগরিক মধ্যবিত্তের নৈমিত্তিক জীবন লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কবি কেবল বহির্বাস্তবতা বর্ণনা করেই নিবৃত্ত হননি। বহির্জগৎ থেকে চেতনলোকে এবং চেতনলোক থেকে মগ্নচেতনলোকে ক্রমাগত ডুব দিয়েছেন

কবি। বহির্জগৎ, চেতনলোক ও মগ্নচেতনলোকে অবাধে গতায়াত করেছেন কবি সমগ্র কবিতা জুড়ে। 'মনোবাস্তব ও বহির্বাস্তবের মিশ্রণ প্রায়মত্ততায় পর্যবসিত হয়েছে 'হ্যাঁ'তে: কবিতাটিতে উক্তির পর মত্ত উক্তি, চিত্রের পর মাতাল চিত্র এসে এক উদ্ভট উৎসব পেতেছে' (হুমায়ুন ২০১৪: ১২০)। ফলত কবিতার শরীরে বাস্তব ঘটনার সাথে সাথে পরাবাস্তব অনেক উপাদানের সন্ধান মেলে।

কবিতাটির প্রথম দুটি স্তবকে একজন ঢাকাবাসী সাংবাদিকের নৈমিত্তিক জীবনের বহির্জাগতিক বিবরণ দিয়েছেন কবি। তৃতীয় স্তবকে ম্যান্ডোলিনের সুরের অনুষঙ্গে বহির্জগৎকে সরিয়ে দিয়ে কবিতার ভূগোল দখল করে নেয় মগ্নচৈতন্যের জগৎ। এক ঝলকে পাঠকের সামনে উঠে আসে ডাচ পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পী ভ্যান গগের (১৮৫৩-১৮৯০) চিত্রকর্মের প্রচ্ছায়ায় নির্মিত কবির মগ্নচৈতন্যের একটি দৃশ্য:

হ্যাঁ এই তো সেদিন ম্যান্ডোলিন শুনে
হ্যাঁ একরাশ সূর্যমুখীর ভেতর থেকে একটা বাঘ বেরিয়ে এলো
হ্যাঁ সেই বাঘ ডোরাকাটা কিনা মনে নেই
হ্যাঁ জ্বলজ্বলে সেই বাঘ সূর্যমুখী ফুলগুলি খেতে খেতে
হ্যাঁ নিজেই বিপুল এক সূর্যমুখী (শামসুর ২০০৮: ৪২৪)

ম্যান্ডোলিন, বাঘ আর সূর্যমুখীর প্রতীকে কবির মগ্নচৈতন্যের ইচ্ছা ও তার চরিতার্থতাই প্রকাশিত হয়েছে। কবি নিজে একজন শব্দশিল্পী। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে যে কবিতা রচনা করেন তিনি, তাতেও লেগে থাকে তাঁর মগ্নচৈতন্যে পুঞ্জীভূত কামনা-বাসনা আর স্মৃতিরাশির আঘ্রাণ:

হ্যাঁ সেই শব্দাবলির শরীর থেকে ভেসে আসে
হ্যাঁ ভেসে আসে সূর্যমুখী চিতাবাঘ আর হরিণের ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে গোরখোদকের ঘামের ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে শ্রমিকের ঘুমের ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে লতাগুল্ম ফলমূলের ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে আসবাবপত্রের ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে মা আর সন্তানের চুমোর ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে নারীর ভেজা চুল আর স্তনের ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে প্রেমিকের স্বপ্নের ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে দুঃখিত মানুষের অশ্রুর ঘ্রাণ (শামসুর ২০০৮: ৪২৪)

পরবর্তী স্তবকত্রয়ে কবি বিংশ শতাব্দীতে বসবাস-সূত্রে অর্জিত মগ্নচৈতন্যিক স্মৃতিপুঞ্জকে তুলে ধরেন বাস্তব-পরাবাস্তবের সংমিশ্রণে। যেমন নিম্নোক্ত স্তবকে কবির দৃষ্ট চিত্রাবলির মধ্যে আছে ইতালীয় চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯), ইরানি কবি ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১), জার্মান মনোবিজ্ঞানী কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং, ফরাসি প্রতীকবাদী কবি আর্তুর র‍্যাঁবো (১৮৫৪-১৮৯১), জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫), জার্মান ফিল্ড মার্শাল এর্ভিন রোমেল (১৮৯১-১৯৪৪) প্রমুখ ব্যক্তির পরাবাস্তব কর্মকাণ্ডসমূহ:

হ্যাঁ লিওনার্দো দা ভিঞ্চির হাত একালের চুলে বিলি কাটে
হ্যাঁ দেখি খৈয়ামের খুলি গোলাপের তোড়া হয়ে
হ্যাঁ পড়ে থাকে পুরানো প্রাসাদের নাচঘরে
হ্যাঁ দেখি ইয়ুং স্বপ্নারণ্যে হেঁটে যান ছড়ি হাতে
হ্যাঁ দেখি ইয়ুংয়ের
কোট অবচেতনের মুখোমুখি মাতাডোরের পোশাক
হ্যাঁ দেখি র‍্যাঁবো ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দিচ্ছেন কবিতা
হ্যাঁ দেখি আইনস্টাইন ওভারকোট আর বেহালার বাক্স নিয়ে
হ্যাঁ পার হচ্ছেন গনগনে জার্মানির সীমান্ত
হ্যাঁ দেখি মরুশেয়াল রুমেলের মুঠো থেকে বেরিয়ে আসছে ট্যাঙ্ক (শামসুর ২০০৮: ৪২৪-৪২৫)

দীর্ঘ তিনটি স্তবকব্যাপী কবি কিউবিস্ট ভঙ্গিতে যে পরাবাস্তব চিত্রাবলি তুলে ধরেছেন তা সম্মিলিভাবে সমগ্র বিংশ শতাব্দীর দৈশিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতিকেই মূর্ত করে তোলে। তবে চিত্রগুলো বস্তুজগতের নয়, মগ্নচৈতন্যের জগতের। যে সব চিত্র কবি দেখছেন তার শিরোনাম 'দেখি সভ্যতার চোখে সূর্য অস্ত যায় অস্ত যায়'। তবে অস্তগামী সূর্যের দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাকে ভবিতব্য হিসেবে মেনে নিতে রাজি নন কবি। তাই সামষ্টিক প্রচেষ্টায় সকল নেতিবাচকতাকে দূর করে ইতিবাচকতার ফুল ফোটানোর দৃঢ় প্রত্যয়ের ঘোষণা দিয়ে তিনি কবিতাটির সমাপ্তি টানেন।

'শতাব্দীর বিদীর্ণ হৃদয় থেকে' কবিতায় শামসুর রাহমান এক বৈরী শতাব্দীতে বসবাসের অভিজ্ঞতা ও তৎসঞ্জাত মগ্নচৈতন্যের দৃশ্যাবলি তুলে ধরেছেন। অস্তিত্বের প্রগাঢ় যন্ত্রণা নিয়ে কবি এক প্রতিকূল সময়ে জীবনযাপন করছেন। আত্মবিবরবাসী কবি বিচ্ছিন্ন তাঁর সমসাময়িকদের থেকেও। তাই আপন সুখশূন্য মনোলোককে নিয়ত সংগুপ্ত রেখে বাইরে আপাত স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব বজায় রেখে দিনযাপনে অভ্যস্ত তিনি। তবে বিগত স্বপ্নসৌন্দর্যময় দিনের সুখস্মৃতি মগ্নচৈতন্যের গভীরে আজও কবিকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেয়। বর্তমান স্বপ্নরিক্ত, কিন্তু কৈশোর-যৌবনের সেই স্বপ্নাবেশ সৃষ্টিকারিণী আজও ঝিল, ঝাউ, মাছ, হ্রদ বা পাখির স্নিগ্ধতাসঞ্চারী প্রতীকের আশ্রয়ে কবির মগ্নচৈতন্যে গ্রথিত:

একদা স্বপ্নিল করিডরে যার শরীরের চন্দ্রোদয় দেখে
ছিলাম আচ্ছন্ন সারাক্ষণ তাকে ঝিল, ঝাউগাছ,
অথবা সোনালি মাছ
প্রাচীন হ্রদের কিংবা পাখি রূপে হৃদয়ের অভ্যন্তরে রেখে
বস্তুত সংসারকানা আজও আমি। (শামসুর ২০০৮: ৪২৬)

বহির্জগৎ যতই বিরূপ হোক, মগ্নচৈতন্যের জগতে সেই স্বপ্নিল স্মৃতিকে নৈসর্গিক নানা উপাদানের প্রতীকে আজও ধারণ করছেন কবি। কিন্তু এ তো অতীতস্মৃতি, এর বিপরীতে বর্তমান সময়ের হৃদয় যেন বিদীর্ণ, অবিরল ক্ষরিত হচ্ছে বেদনার রক্তবিন্দু। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমনই অসুস্থ সময়ে বসবাস করতে হচ্ছে কবিকে। তাই তিনি অনিবার্যভাবেই সংসার-কানা। কারণ কোনো চক্ষুষ্মান সত্তার পক্ষে এই সময়ে টিকে থাকাটা অসম্ভব। ভীষণরূপে

প্রতারক এ সময়। অদ্ভুত এক সময়ে ততোধিক অদ্ভুত এক শহরে যে জীবন কবি যাপন করছেন সেই জীবনযাপনে মগ্নচৈতন্যের অতীত সুখস্মৃতিই একমাত্র শুশ্রূষা।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় কবির স্বপ্নভঙ্গজনিত বিষাদ ও তৎজাত বিপন্ন অস্তিত্বের প্রগাঢ় যন্ত্রণার অনুভূতি নিয়েই কবির জিজ্ঞাসা: 'ফের বাঁশি বাজাবে কি উধাও বিশ্বাস/ নিষ্ফলা প্রান্তরে, দগ্ধ বনে, জনশূন্য নদীতীরে,/ অসুস্থ শহরে?' এ প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন কবি আত্মোপদেশের ভঙ্গিতে: 'তুমি কপটতা ছেড়ে দুস্থ ভিড়ে/ মিশে গিয়ে জেনে নাও জগৎ-সংসার কবিতার/ খাতা কিনা। সুখ চাই সুখ চাই বলে সত্তার নিভৃত মূলে/ কখনো এনো না ডেকে বিষপিঁপড়ার ঝাঁক;'। পারস্পরিক সংলগ্নতার সূত্রে কবি অনুপ্রবেশ করেন মগ্নচৈতন্যের জগতে। সেখানে দুলে ওঠে এক লতাগুল্মময় মনোভূমি। মুহূর্তের জন্য মগ্নচৈতন্যের ক্ষতচিহ্নে ছড়ায় জ্যোৎস্নাধারার স্নিগ্ধতা, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার খঞ্জ ভিখিরির দল আর গৃহবন্দি উন্মাদ দখল করে নেয় কবির মগ্নচৈতন্যের ভূভাগ:

> তুমি
> দূরত্ব আবৃত্তি করে যখন নিকটে চলে আসো কারো, তার
> লতাগুল্মময় মনোভূমি
> দুলে ওঠে, সোহাগের সিংহাসনে ব'সে পা দোলানো ভালো লাগে,
> ভালো লাগে কবেকার ক্ষতচিহ্নে জ্যোৎস্নাধারা বয়ে
> যেতে দেখে অবসরে। হঠাৎ আবার মগজের কোষে জাগে
> পদহীন ভিখিরি দল, বন্ধ ঘরে কে এক উন্মাদ ভয়ে
> জড়ো-সড়ো কিংবা নোংরা নখে দেয়ালে থেকে রোদ
> মুছে ফেলবার জেদে দাঁতে দাঁত ঘষে। (শামসুর ২০০৮: ৪২৭)

এক ঝটকায় যেন লতাগুল্মময় মনোভূমির চিত্র সরে গিয়ে বীভৎস চিত্র ভেসে ওঠে মগ্নচৈতন্যের ক্যানভাসে। এরপর একে একে সেই ক্যানভাসে চলচ্চিত্রের মতো ভেসে উঠতে থাকে অতীতের কোনো এক নারী, নষ্ট সভ্যতার মূল্যবোধের অবক্ষয়ে সন্ত্রস্ত দার্শনিক, করোটিতে মদ্যপানরত কবি, প্রেমিকের মৃতদেহ প্রভৃতি:

> ঘুরে দেখি, ডানপাশে
> আর্কাইভ জেগে ওঠে—প্রচীন দ্রব্যের স্তূপ থেকে
> আস্তে একাকিনী নারী, কবে যেন হয়েছিল দেখা, উঠে আসে
> ছড়িয়ে স্মৃতির মসলিন; একজন দার্শনিক মূল্যবোধ
> বিষয়ে ভাবিত, হাতে তাঁর নষ্ট সভ্যতার ভগ্নাংশ, বিবেকে
> প্রভূত পীড়ন, অলিন্দের খোলা হাওয়া চাই বলে
> জংধরা চেয়ারের কাছ থেকে বাঁ দিকে দাঁড়ান সরে; কবি
> করোটিতে সুরা পান করে খসখসে পাণ্ডুলিপি জ্বলজ্বলে
> পাখির মতন দেন ছেড়ে। (শামসুর ২০০৮: ৪২৭)

লক্ষ্যণীয় এই চিত্রগুলোর মধ্যে ভাবগত বৈপরীত্য বিদ্যমান। এই বৈপরীত্য কবির মগ্নচৈতন্যের দ্বান্দ্বিকতাকেই প্রকাশ করে। তবে গভীর আশ্বাসের কথা দিয়েই কবিতাটির ইতি টেনেছেন

শামসুর রাহমান। সমাপ্তিতে এসে বর্তমান শতাব্দীর বিদীর্ণ হৃদয় থেকে অবিরল ঝরছে যে রক্তবিন্দু তার শুশ্রূষার জন্য কবি তাঁর আপন করুণ বিউগলকে গভীর আশ্বাসের বাণীবাহী হয়েই ধ্বনিত হয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন।

'সে এক খননকারী' কবিতায় আছে কবির আত্মখননের পরাবাস্তব দৃশ্য। কবিতায় যে খননকারীর কথা বলা হয়েছে তার অস্তিত্ব যে জগতে সত্য তা কবির মগ্নচৈতন্যের জগত। এই খননকারী অবিরাম খুঁড়ে চলেছে কবির মগ্নচৈতন্যের বিস্তীর্ণ ভূভাগ। তার খননকার্যের উদ্দেশ্য অজানা। কবি প্রশ্ন করেছেন: 'অমন করে ক'হাত মাটি খুঁড়লে মেলে/ খুব-লুকোনো স্মৃতিকণা?' বোঝা যাচ্ছে অর্থহীন নয় এ নিরন্তর খননকর্ম। মগ্নচৈতন্যের অতলান্তের স্মৃতিরাশিকে তুলে আনাই এই খননের লক্ষ্য। খননকারীর যে সকল কর্মের বর্ণনা কবি দেন সেগুলোর সবই পরাবাস্তব; তাই সন্দেহ থাকে না যে, সে আসলে কবির মগ্নচৈতন্যলোকেরই বাসিন্দা:

> রোদকে বাজায় দশ আঙুলে পুশিদা এক সুরে।
> শেকড়-বাকড় উপড়ে ফেলে, পা মেলে দ্যায়
> অনেক দূরে—যেন সে ঐ
> আকাশ ছোঁবে।
> জ্যোৎস্না চেটে নেয় তুলে সে রাতের শরীর থেকে। (শামসুর ২০০৮: ৪৪৩)

কবিতার অন্তিম স্তবকে এই খননকারী আর কবি অভিন্ন হয়ে যান। কবি নিজেই যেন এই খননকারী যিনি নিরন্তর আত্মখননরত:

> কখন আবার খুঁড়তে থাকে অক্ষিগোলক দুটি,
> খুঁড়তে থাকে নিজের রুক্ষ বুকের পাঁজর,
> খুঁড়তে থাকে শরীরটাকে।
> কেউ জানে না।
> গভীরভাবে নিজেকে সে খুঁড়তে থাকে শুধু। (শামসুর ২০০৮: ৪৪৩)

'নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি' কবিতায় আফ্রোদিতির আবির্ভাবে আপন মগ্নচৈতন্যে অবগাহন করে কবির সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞার উন্মেষ এবং আফ্রোদিতির অন্তর্ধানে কবির সৃষ্টিশীল সত্তার পক্ষাঘাতের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। গ্রিক পুরাণের প্রেম-আনন্দ-আবেগ-সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতি। প্রেম-আনন্দ-আবেগ-সৌন্দর্যই একজন কবিকে সৃষ্টিশীল করে তোলে। কিন্তু এই কবিতার 'কবি ও তাঁর প্রেরণাদাত্রী আফ্রোদিতি নেকড়ে-সদৃশ বাস্তবের কবলিত। এটি একটি আত্মনাট্যও, তাঁর ভূমিকা দুই রকম—একদিকে তিনি স্বপ্নাচ্ছন্ন, আরেকদিকে ক্লান্ত, ধস্ত, একাকী ও প্রেরণাশূন্য' (বেগম আকতার ২০১৭: ৯৯)। কবিতার প্রথম তিনটি স্তবককে বলা যায় দেবী আফ্রোদিতির আবাহন ও মগ্নচৈতন্যের জগতে অনুপ্রবেশের প্রস্তুতিপর্ব। চতুর্থ স্তবকে আফ্রোদিতির আগমনে কবি প্রবেশ করেন তাঁর মগ্নচৈতন্যের জগতে:

> ঘর কি সমুদ্র হতে পারে? নইলে কী করে সেখানে
> সহজেই আফ্রোদিতি আসে তার সমস্ত শরীরে

স্বপ্নের মতন ফেনা নিয়ে? যখন সে এলো ভেসে,
ঘরের দেয়াল মুছে গেল; গেল উবে আসবাব। (শামসুর ২০০৮: ৪৪৯)

অনড় আসবাবের ভিড় আর চারদেয়ালের বন্ধন কবির সৃষ্টিশীলতার উন্মুক্ত ডানায় ওড়ার অন্তরায়। মগ্নচৈতন্যের দিগন্তহীন প্রান্তরেই কবির সত্তার বাধাহীন বিচরণ। আফ্রোদিতির আবির্ভাব কবিকে সেই উন্মুক্ত প্রান্তরেই নিয়ে যায়। তাই তখন ঘরের দেয়াল মুছে যায়, উবে যায় ঘরের আসবাবপত্র। তবে বেশিক্ষণ কবি মগ্নচৈতন্যের ওই খোলা প্রান্তরে বিচরণ করার সুযোগ পান না: 'সহসা বিদায়,/ যেন স্বপ্ন জাতক্রোধে ছুড়ে দেয় ধুলায় আমাকে।' স্বপ্নময় মগ্নচৈতন্যের সাথে যেন কবির জাতিগত বৈরিতা। তাই তিনি বলেন: 'ব্যর্থ মানুষের মতো চেয়ে থাকি, ঘরের দেয়াল/ ফিরে আসে, দেখি ঠিক মাথার ওপরে আছে ছাদ।' স্বপ্নময় মগ্নচেতনলোক থেকে কবি বিতাড়িত, ভ্রষ্ট। তাঁর চৈতন্যে এখন কেবলই কণ্টকাকীর্ণ ফণিমনসার বনের ক্রমবর্ধন, তাই কবি আজ স্থবির:

হে নিশীথ, আজ আমি কিছুই করতে পারব না।
আমার মগজে ফণিমনসার বন বেড়ে ওঠে,—
দেখি আমি পড়ে আছি যুদ্ধ-ধ্বস্ত পথে কী একাকী;
ভীষণ আহত আমি, নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি! (শামসুর ২০০৮: ৪৪৯)

'নাছোড় অতিথি' কবিতায় আছে একটি পুরোদস্তর পরাবাস্তব গল্প। এ কবিতায় কবির যে সংকটের পরিচয় মেলে তা বাস্তব সংকট নয়; মগ্নচৈতন্যগত সংকট। কবির শয়নকক্ষে তাঁরই শয্যায় শায়িত যে নিস্পন্দ অতিথির সাক্ষাৎ মেলে কবিতায়, সেও কবির মগ্নচৈতন্যেরই বাসিন্দা এবং কবিরই অবিচ্ছিন্ন সত্তা। সর্বপ্রকার সম্ভাবনারহিত এই নাছোড় অতিথি—'পতিত জমির মতো, যেখানে কখনো ফসলের/ স্বর্ণশীষ গীতিকবিতার মতো করবে না গুঞ্জন।' কবির গৃহাভ্যন্তরে নিদ্রিত তাঁর সার্বক্ষণিক অস্বস্তির কারণ এই অনাবাদিভূমিসদৃশ অনড় অতিথির স্থবিরতা ও মৃত্যুগন্ধী ঘুম কবি ভাঙাতে চান 'অক্ষরের ব্যান্ডেজ' ও 'পাণ্ডুলিপির চুমু' তথা শিল্পের শুশ্রূষায়। কিন্তু এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতঃপর কবি মগ্নচৈতন্যগত পক্ষাঘাতগ্রস্ত এই সত্তাকে ঠেলে দিতে চান বিস্মৃতির অতল গহ্বরে; কিন্তু তাতেও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন তিনি। নিজের অভ্যন্তরে জ্যান্ত মৃতদেহ সদৃশ এই সত্তাকে নিয়ত বয়ে বেড়ানোই যেন কবির ভবিতব্য:

টেবিলে ডালিয়া,
ভাস-এ গোলাপের তোড়া; আমি ব্যাঞ্জো বাজিয়ে বাজিয়ে
নিদ্রিত মানুষটিকে বিস্মৃতির কন্দরে পাঠাতে
চাই প্রতিদিন, হায়, ব্যাঞ্জোধ্বনি, গোলাপ, ডালিয়া

থেকে মৃত্যুগন্ধ উঠে আসে। চেয়ে থাকি তার দিকে,
এই চেয়ে-থাকা যেন নিয়তি আমার। (শামসুর ২০০৮: ৪৫৯)

এডগার এ্যালেন পো'র 'The Black Cat' গল্পের কথক যেমন তার স্ত্রীকে হত্যা করে মৃতদেহটি ঘরের দেয়ালের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, কবিও তেমনি তাঁর ঘরের এই নাছোড় অতিথিকে

দেয়ালের গহ্বরে সমাহিত করতে চেষ্টা করেন, কখনো ব্লিচ করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন, আবার কোনো কোনো রাতে মেঝেতে সুড়ঙ্গ কেটে বহুদূরে মাটির নিচে পুঁতে আসেন। কিন্তু কিছুতেই রেহাই মেলে না তার হাত থেকে। কারণ এই অতিথি কবিরই অভিন্ন সত্তা। কবি চাইলেই তাকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না। কবির ঘর এখানে তাঁর দেহের প্রতীক।[১০] এই অতিথির বসবাস কবিরই অভ্যন্তরে:

তবু সে আমার ঘরে শুয়ে থাকে সমস্ত শরীরে
ঘোর কালো নক্ষত্রের মতো অক্ষরের ভিড় নিয়ে।
তার পাশে ঠায় ব'সে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে
কোনো কোনো স্তব্ধ মধ্যরাতে শাবল গাঁইতি হাতে

মেঝেতে সুড়ঙ্গ কেটে তাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাই
সবার অলক্ষে বহুদূর একা-একা, পুঁতে আসি
মাটির অনেক নিচে। শিস্ দিতে দিতে ঘরে ফিরে
দেখি ঠাণ্ডা বিছানায় শায়িত সে নাছোড় অতিথি। (শামসুর ২০০৮: ৪৬০)

৪

বিশ্লেষিত কবিতাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়: 'সে এক খননকারী' কবিতায় কবি কেবল মগ্নচৈতন্যের ভূভাগ খননের চিত্রকল্পই সৃষ্টি করেছেন; খননলব্ধ উপাদানসমূহের পরিচয় মেলে অন্যান্য কবিতায়। তন্মধ্যে 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' কবিতায় শামসুর রাহমান বাংলাদেশের স্বপ্ন শিরোনামে বাঙালির যে সামূহিক নির্জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা সম্পূর্ণত সমকালীন একটি রাজনৈতিক ঘটনাজাত; 'অপরাহ্ণে একদল মিউজিসিয়ান'-এ প্রকাশিত হয়েছে কবির মগ্নচৈতন্যে অবদমিত স্বপ্নীল বাসনারাজি ও তা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা; 'হ্যাঁ'-তে আছে কবির ব্যক্তিজীবন, দৈশিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতিসঞ্জাত চেতন ও মগ্নচেতনলোকের দৃশ্যাবলির বহুকৌণিক উপস্থাপন; 'শতাব্দীর বিদীর্ণ হৃদয় থেকে' কবিতায় বিধৃত বিংশ শতাব্দীতে বসবাসের অভিজ্ঞতাজাত কবির মগ্নচৈতন্যিক চিত্রমালা; আর 'নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি' ও 'নাছোড় অতিথি' কবিতাদ্বয়ে আছে বহির্বাস্তবের বৈরিতায় পর্যুদস্ত কবির মগ্নচেতন সত্তার পরিচয়।

কবিতাগুলোর মধ্যে একমাত্র 'অপরাহ্ণে একদল মিউজিসিয়ান' কবিতায় কবির মগ্নচৈতন্যের বাসনারাজির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাই এই কবিতায় বিধৃত মগ্নচৈতন্যের চিত্রাবলি তুলনামূলকভাবে প্রশান্তিদায়ক। এছাড়া বাকি সবগুলো কবিতায় বিধৃত মগ্নচৈতন্যের দৃশ্যাবলি বাহ্যজগতের কালিতে অঙ্কিত। তাই সেগুলোতে নয়নাভিরাম দৃশ্যের চেয়ে বীভৎস ভীতিকর দৃশ্যেরই আধিক্য। কবির মগ্নচৈতন্যের ক্যানভাসের সিংহভাগ অংশ জুড়েই চিত্রিত তাঁর স্বদেশের সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা। এই কাব্যেরই 'আমার বয়স আমি' কবিতায় কবি বলেছেন 'আমার বয়স তস্করের মতো চতুষ্পার্শ থেকে/ এলেবেলে কত কিছু নিয়ে যায় ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় স্মৃতির গুহায়' (শামসুর ২০০৮: ৪২১)। এই স্বীকারোক্তি সর্বাংশে

সত্য। এই স্মৃতির গুহাই কবির মগ্নচৈতন্যের জগৎ যেখানে বাহ্যজগতের নানা ভাব-বস্তু-ঘটনা গিয়ে স্মৃতিরূপে জড়ো হয়েছে।

টীকা

১. 'জীবনের যাবতীয় মূল্যবোধকে অস্বীকার করে, সাহিত্যের সনাতন পন্থাকে আঘাত হেনে, মানবমনের অবচেতনস্তরের গুরুত্বকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে এবং কার্যকারণের ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত সম্পর্কের নিরর্থকতাকে সরবে ঘোষণা করে ডাডাবাদীরা মেনে নিলেন অন্তর্লোকের স্বৈরাচার, কাব্য-ভাষায় অনিয়ন্ত্রিত স্বতঃস্ফূর্ততা, যথেচ্ছ শব্দ-নির্বাচনে কবির স্বাধীনতা। যেহেতু মানুষের সমস্ত ভাবনা সুসংলগ্ন নয়, অতএব কাব্যে সুগঠিত বাক্য ব্যবহার, ডাডাবাদীদের মতে, একধরনের কৃত্রিমতা। তাঁরা মনে করতেন, মহৎ সাহিত্যিক বলে পরিচিত যাঁরা, তাঁরা সকলেই পরানুকারী ও কুম্ভীলক। যেহেতু মানুষ ছন্দোবদ্ধ পথে চিন্তা করে না, তার প্রতিটি ভাবনা অখণ্ড একটি প্রবাহে আসে না। ফলে যে-সমস্ত সাহিত্যিক ভাবকে নিয়মিত পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত করে সালংকৃত মূর্তিতে উপস্থাপিত করেন তাঁরা কাব্য সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে অপরের প্রদর্শিত পথে নিশ্চিন্তে পদচারণা করেন।' (বিমলকুমার ২০০৬: ১৭৭)

২. খোন্দকার আশরাফ (২০১৩: ১৭৪)

৩. যেমন, 'দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পোষা' (প্রবাদ)।

৪. 'বাঙালি সমাজে উপহসিত ভাঁড় জীবনানন্দের 'অবসরের গান'-এ সম্রাটাধিক মূল্য ও সম্মান পেয়েছিল; ধারণ করেছিল দুস্থ মানুষের ট্র্যাজেডিও। শামসুর রাহমান সে-ভাঁড়কে রূপান্তর দেন ক্লাউনে, এবং দীর্ণ মহৎ আধুনিক মানুষ ও শিল্পীর প্রতীকে পরিণত করেন।' (হুমায়ুন ২০১৪: ২০৭)

৫. 'The extraordinary characteristic of the member of being able to raise itself against the force of gravity, one of the phenomena of erection, leads to symbolic representations by balloons, aero planes, and more recently, Zeppelins. The dream has another far more expressive way of symbolizing erection. It makes the sex organ the essential part of the whole person and pictures the person himself as flying.' (Freud 1920: 127)

৬. 'The more conspicuous and more interesting part of the genital to both sexes, the male organ, has symbolical substitute in objects of like form, those which are long and upright, such as sticks, umbrellas, poles, trees, etc.' (Freud 1920: 126)

৭. 'The satisfaction in one's own genital is suggested by all types of play, in which may be included piano-playing.' (Freud 1920: 128)

৮. 'The breasts must be included in the genitals, and like the larger hemispheres of the female body are represented by apples, peaches and fruits in general. The pubic hair growth of both sexes appears in the dream as woods and bushes... the garden a frequent symbol of the female genitals. Fruit does not stand for the child, but for the breasts. Wild animals signify sensually aroused persons, or further, base impulses, passions. Blossoms and flowers represent the female genitals, or more particularly, virginity.' (Freud 1920: 128-130)

৯. 'Special representations for the relations of the sexes are less numerous in the dream than we might have expected from the foregoing. Rhythmic activities, such as dancing, riding and climbing may be mentioned,' (Freud 1920: 128-129)

১০. 'The only typical, that is, regular representation of the human person as a whole is in the form of a house, as was recognized by Scherner who, indeed, wished to credit this symbol with an overwhelming significance which it does not deserve.' (Freud 1920: 125)

সহায়কপঞ্জি

অশ্রুকুমার সিকদার (২০১৯)। 'সুররিয়ালিজম্', *বুদ্ধিজীবীর নোটবই* (সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত)। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী।

এম. এ. হামিদ (২০১৭)। *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা*। ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১৩)। *রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার অক্ষ-দ্রাঘিমা*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৬)। *সাহিত্য-বিবেক*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

বিরঞ্জন রায় (২০২১)। *সিগমুন্ড ফ্রয়েড এবং অফ্রয়েডীয় ফ্রয়েডবাদীগণ*। ঢাকা: সংহতি।

বেগম আকতার কামাল (২০১৭)। *শামসুর রাহমানের কবিতা: অভিজ্ঞান ও সংবেদ*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

মঈন চৌধুরী (২০১৯)। 'ফ্রয়েড, লাকাঁ ও সমকালীন বিজ্ঞানদর্শন', *দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ সমগ্র* (শওকত হোসেন সম্পাদিত)। ঢাকা: বেহুলা বাংলা।

শামসুর রাহমান (২০০৮)। *কবিতাসমগ্র-১*। ঢাকা: অনন্যা।

হুমায়ুন আজাদ (২০১৪)। *শামসুর রাহমান: নিঃসঙ্গ শেরপা*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

Freud, Sigmund (1913). *The Interpretation of Dreams* (Translated by A. A. Brill). New York: The Macmillan Company.

Freud, Sigmund (1920). *A General Introduction to Psychoanalysis* (Translated by G. Stanley Hall). Pantianos Classics.

Freud, Sigmund (1959). *An Outline of Psycho-Analysis* (Translated by James Strachey). London: The Hogarth Press & The Institute of Psycho-Analysis.